ইচ্ছে-মানুষ, সমাত-মানব

তয়িতা দত্ত

অ্যাসোসিয়েত প্রফেসর, স্নাতোকত্তোর বাংলা বিভাগ, বেথুন কলেত

উপনিষদে আছে, 'তীবান্ বিস্সর্ত ভূম্যাম'। তীব বিস্র্তিত হোক ভূমিতে। ভূমি-পৃষ্ঠে লেখা হোক তার অদৃষ্ট। মৃত্তিকার তল-অবতল তুড়ে সে ছড়িয়ে পড়ুক প্রত্মান্তরে। মাতির গন্ধ-স্পর্শ নিয়ে সুখে বাঁচতে শিখুক। কিন্তু মানুষ! ধরিত্রীর ঠিকানায় কি বাঁধা যাবে তাকে। মৃৎ ছাড়িয়ে চিদ্লোকে তার গতি। গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাহৃতিতে প্রথমে স্থানবাচক 'ভূর্ভুব স্বঃ', বলে তাই মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে উচ্চারণ করতে হল পরমদেবতার সঙ্গে ইহ-মানবের ধীশক্তিগত যোগের মন্ত্র। 'ভর্গো দেবস্য ধীমহি যো নঃ প্রচোদয়াৎ।' এই যোগাযোগ চৈতন্যের। আত্মবৃত্তকে ছাড়িয়ে যাবার। স্ব-ইচ্ছাশক্তির তেরে যার উদ্বোধন সম্ভব। তপস্যায় প্রার্থনায় আর নিঃশব্দ নিবেদনে ভারতবর্ষ একদিন ইচ্ছাশক্তির সেই তুঙ্গতাকে ছুঁয়েছিল। পৃথিবীর দুঃখে, দুর্ভোগ, বিচ্ছেদ, শোক, পরাত্য় তখন আর সতত যন্ত্রণার নয়। দুঃখের মন্থনে লব্ধ আনণ্ডৈর। মহাভারতে এই প্রাপ্তির কথা আছে। সেই শক্তির কথা আছে। যুধিষ্ঠিরকে বক্রূপী ধর্ম যখন প্রশ্ন করেছিলেন 'পরাত্য় কী', উত্তরে ত্নেষ্ঠ পান্ডব বললেন 'ত্যই পরাত্য়'। বলবেনই তো তিনি। এই যে এত দুঃখ, এত যুঃ, এত মৃত্যু—পরিণামে কী? না কয়েক হাত তমি। সে তমিতে পা দিয়ে দাঁড়ানো গেল, হৃদয় দিয়ে ভোগ করা গেল না। তা'লে এতদিনের উদ্যম-উৎসাহ প্রাপ্তি কোথায়? নেই। এর নাম পরাত্য়। মর্ত্য-প্রাপ্তির মধ্যে অপ্রাপ্তির চির-দীর্ঘশ্বাস। সুতরাং দাঁড়াল, ত্য়-ই পরাত্য় এবং সম্পূর্ণ পরাতিত হবার মধ্যে লুকিয়ে আছে তয়ের আনণ্ড। এই যে একের ভেতরে আর একের মিশে থাকা, থিসিস-অ্যান্তিথিসিসের সিন্থেসিস রূপ-ধারণ; সুখে দুঃখ, সম্ভোগে-বিপ্রলম্ভ, তয়ে পরাতয়ের বোধ—এই অভিনব তীবন সঞ্জীবনীর পথেই ধীমান মানুষ ক্রমশ স্বতন্ত্র হয়ে গেলেন ভূমিচারী, শরীর-সর্বস্ব, ক্ষুধাপ্রবণ তীবের কামময় অভিব্যক্তি থেকে।

মনস্বীতন তখন আর অস্তি নাস্তির দ্বণ্ডৈ পীড়িত হন না। তাঁদের কাছে 'অস্তি কি নাস্তি কি উভেপি অন্ত/অস্তি তি অনস্তি ইতি ইমেপি অন্তা/মধ্যেহি স্থানম প্রকরতি পন্ডিতাঃ'। কোন পুরাণ সময় থেকে অধুনা পর্যন্ত এরা খুঁতেচলেন সময়-স্বভাবের এমন দু'মুখো চরিত্রের শিকড়। বুঝতে চান কেন বুঞি-হতবুঞির অবিরাম ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছে দুনিয়া। 'A tale of two cities'-এর গোড়ায় চার্লস ডিকেন্স যেমনতা লিখেছিলেন, 'It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us, we are all going direct to Heaven, we are all going direct the other way.....''. ডিকেন্সের এই তমাত উপলব্ধির প্রকাশকাল উনিশ শতকের মধ্যলগ্ন। প্রায় সমকালীন আর একতন ফরাসী দার্শনিক মঁতেন ত্নালেন, মানুষ নামক তীবতি 'bashful, insolent; chaste, lustful; parting, silent; labourious, delicate; ingenious, heavy; melancholic, pleasant; lying, true; knowing, ignorant; covetous and prodigal।' আশ্চর্য একরূপতা পরস্পরের তীবন দৃষ্টিতে। বিপরীতের যুগ্মকে সেতেওঠা পৃথিবীকে যেন ঠিকঠাক চিনে নিচ্ছেন এঁরা। মানুষের তীবননাত্যে ঘতে চলা একের পর এক দৃশ্যে পালাক্রমে এই যে বিপরীতের আনাগোনা, শেলীর বাচনে যা 'Our sincerest laughter with some pain is fraught' একে মহাভারতীয় পৌরাণিক প্রহর থেকে বর্তমান পর্যন্ত মনীষীরা উপলব্ধি করেছেন যথার্থভাবে। সহত ধরতাইয়ে কষেছেন ততিল তীবনের অঙ্ক। আত্মকামতার হাত থেকে মুক্তির পথে সম্ভব হয়েছে এই গাঢ় উপলব্ধি। ত্য়-পরাত্য়, পাওয়া না-পাওয়ার খুচরো হিসেবে তল ঢেলে তখন অনায়সে বলা গেছে,

মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি উৎসের আনণ্ডধারা আমি।

কীভাবে আয়ত্ব করা যায় এই গহন আত্মস্থতা! বিশেষ করে আতকের যুগে। যেখানে 'ধাবমান সময়' আত্মস্থ হবার, অভিমুখী হয়ে ওঠবার ধ্যানমগ্ন নৈঃশব্দ কে হারিয়েছে! তন্ময়তাকে হারিয়েছে। চারপাশে যন্ত্রসভ্যতার উৎসবের মধ্যে, ধনতন্ত্রের কাঞ্চনমূল্যে বিকিয়ে যাওয়া পৃথিবীর গর্ভে একদম হারিয়ে যাচ্ছে মানুষ। 'তীবান্ বিস্সর্ত ভূম্যাম'-এর তালিকায় অবলীলায় অংশগ্রহণ করেছে সেও! কৃত্রিম সৌণ্ডর্যে সেতেওঠা ধরণীর উদ্দেশ্যহীন প্রমোদের আয়োতনে ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে আর ছুতে যাচ্ছে লক্ষ্যহীন লক্ষ্যের দিকে। আর ছুতছে ছুতছে ক্লান্ত হচ্ছে। 'What is Post-Modernism বইতে নরহরি কবিরাত লিখছেন, ... ''It appears as 'random and directionloy' more like a Carnival..... This is the world of man and woman who quest for the new and the latest in the relationships and experinces, who have a sense of adventure and take risks to explore life's options to the full who are consious they have one life to live' and must work hard to enjoy, experience and express it.'' কাতেই কেবল ঝুমো, নাচো, খাও, পিও। ভেঙে ফেলো পূর্বপুরুষের কালচারাল হেরিতেতের প্রতি আনতি। যৌথ পরিবারের হাত্তরতা দায় পেছনে ফেলে বানিয়ে তোলো 'আমি তুমি আর

সে'-র নিভৃত নিকুঞ্জ। যদি তাতেও ভাঙন ধরে তবে আপাত অতীতের সঙ্গে ক্ষণভঙ্গুর বর্তমান আর স্বপ্ন ভবিতব্যের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ফেলো নিঃসংকোচে। রিয়্যাল নয়, হাইপার-রিয়্যালের হাতে গরম বাতর এখন। যে বাতরে রিলেশনশিপ তছনছ করে অচিরেই গড়ে তোলা যায়-'নতুন'। তবেই না বিশ্ব তুড়ে ইতিহাস-চেতনার মৃত্যু ঘতবে। তাঁ বদরিলার্দ-দের মত পোস্ত-মর্ডান সমাততাত্ত্বিক বলতে পারবেন, এ যুগের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, সব কিছু নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে এই বোধ, 'No Longer exists'। সত্যিই কি কিছু অবশিষ্ট নেই? আছে, কেন্দ্রবিচ্যুত তীবন। স্বভাবতই যা রুতলেস। একমাত্র সন্তানের তন্য আকুল বাপ-মা খুইয়েছেন পুরোনো সম্পর্কের শপথ। সেইসব অভিভাবকের তদ্বিরে অ্যাদ্দিনকার বুনিয়াদি গুরুকূল নির্ভর শিক্ষা রেলিভ্যান্সের ইঁদুর দৌড়ে রূপান্তরিত হয়েছে প্যাকেজিং আউতসোর্সিং-এ। চোখ মেললেই বৃক্ষশূন্য রাস্তার ন্যাড়া দেওয়ালে সাফল্য কোর্সের বিজ্ঞাপন। ক্যারিশমাতিক তীবিকাকেন্দ্রিক কোর্সের হাল-হকিকতের খুঁতিনাতি খবর। রিডাকশন সেলের বাতরে কেবল সেসব লুফে নেবার অপেক্ষা। ঠিক উল্তোদিকে পঞ্চাশ বছর — একশ বছর আগেকার শিক্ষক তীবনের ভ্যালুততখন ক্রমক্ষয়িষ্ণু পতভূমিতে আঁকতে থাকেন রূপান্তরিত পৃথিবীর ছবি। স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ দিয়ে ঘেরা স্বপ্ন-দিনের ঝুলিতে অতীতের খোঁতে সেখানে শুধু মেলে ঘা খাওয়া কিছু ভ্রংশ স্মৃতির আর্কেতাইপ। কারণ উত্তরকাল শিকড় খোঁতে না। তাদের চোখ কেবল হিরন্ময় পাত্রের আলো ঠিকরোনো ঢাকনার দিকে। সেখানে 'সত্যসা পিহিতং মুখং'।

অথচ এই যুগের ভেতরেও পদধ্বনি শোনো যায় ওঁদের। মন্ত্রের মত যাঁরা উচ্চারণ করেন সত্যের সিঙান্ত। কালে কালে তার রূপবদল হয় মাত্র। অন্তঃসার একই থাকে। চর্যাপদের আপ্তবাণী যা বলেছে বহু শতাব্দী আগে, তারই পুনর্নির্মাণ একালে হলে বিস্ময়ের কিছু থাকে না। ৮০ সংখ্যক চর্যায় ছিল 'তে মনগো এর আলাতলা। / আগমপোথী ইষ্টমালা।'

কিংবা '৩৫' সংখ্যক চর্যায়—

'পেখমি দহ দিহ সরবই শূন।
বি অ বিহন্নে পাপ ন পুন্ন।।
.....
চি অরাও মঁই অহার ক এলা।।'

দুয়েরই মোদ্দা কথা—মিথ্যে বেদগ্রাহ্য আচার। মিথ্যে ইষ্টমালা তপ। বৃথা চিত্তের আসক্তিঘেরা তঞ্জাল। এইসব পরিত্যাগ করে চিত্তরাত আহার করো। পরমার্থ প্রাপ্তির সেই এক পথ। দশম-একদশ শতাব্দীর এই ভাবনা মধ্যযুগের শেষ প্রহরে বাউল গান হয়ে বলে—

আছে তোরই ভিতর অতল সাগর
তার পাইলিনা মরণ।
তার নাই কুল কিনারা শাস্ত্র ধারা
নিয়ম কি করম।

আর একালে, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'অতিদূর দেবদারু বীথি' কবিতায় যেন প্রাচীনের সেই নিশ্বাসতুকু বুকে নিয়ে লেখেন,

তীবনবাসনা সেই নীলাঞ্জন ছায়া — যার কাছে গিয়ে তবে বুঝেছি প্রত্যেকে
প্রত্যেকে পৃথক, হ্রস্ব-দীর্ঘ, স্থির-কম্পমান, তনতা একাকী
তাদের গঠিত শান্তি যথাক্রমে শুয়ে পড়ে আছে.....
আমরা শোয়াতে ভারি সুখ পাই-নিষ্প্রাণতা পাই
কাগতে কলমে চাই তাগরণ সাধ চেপে রেখে
আমরা হলুদ ভালোবাসি বলে মুখে বলি তুঁই
আমাদের সাধারণ কাতে সুপ্ত যুগের প্রতিভা।

সুতরাং বোঝা গেল 'প্রত্যেক পৃথক', বোঝা গেল 'তনতা একাকী', তবু যেন...

বুঝি না কিছুই—শুধু নিস্তরঙ্গ ভেসে চলি স্রোতে
বর্তমান মুছে যায় নতুন পাম্সু তুতো পেলে....

কী আশ্চর্য মিল তীবন-বোধে। যুগ-যুগান্তরের ব্যবধানেও তীবনের সংজ্ঞার ঠিকঠাক হদিশে। যুগ-নিরপেক্ষভাবে একলা চৈতন্যবান মানুষতির অন্বেষণ। কখনো পরমার্থের, কখনো একাকিত্বের। যে পৃথিবীতে কোনো মায়া নেই, আলো নেই 'কোনো কান্তিময় আলো/চোখের সম্মুখে নেই যাত্রিকের', সত্তাবান ব্যক্তিতি সেখানে নিতেকে দেখে একতন অপরিচিত আগন্তুক হিসবে। যেন এক অনিবারণীয় নির্বাসনে সে আছে। হারিয়ে যাওয়া দেশেরও কোনো স্মৃতি নেই তার। 'এখন চারপাশে শুধুই শুকনো দিন রস ফুরিয়ে যাওয়া রাত্রি' (ছেলেবেলা/রবীন্দ্রনাথ)। এখন শুধুই স্বগতস্মৃতিচারণ,

অনো কি অনেক যুগ চলে গেছে? মরে গেছে অনেক নৃপতি
অনেক সোনার ধান মরে গেছে অনো নাকি? অনেক গহন ক্ষতি
আমাদের ক্লান্ত করে দিয়ে গেছে—হারায়েছি আনণ্ডৈর গতি
ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই বর্তমান
হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান।

কেন হলাম আমরা বেদনার সন্তান? নভোচারী হবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভূমিচারিতার দিকে চোখ গেছে বলে কি? বাসনা, ভোগ আর খিদের সরিসৃপ লেহনে ক্রমশ ঢুকে পড়ছি বলে? এই যূথবঃ আগ্রাসী লোভের অওতা থেকে সত্যিই কি মুক্তি নেই? এই বোধ সেই তাঁদের যাঁরা অনেকের কোলাহলের মধ্যেও একলা। অথচ খন্ড সময়ের হয়েও সমগ্রের প্রতিনিধি। পুরাণ সময় থেকে আত পর্যন্ত কেবল তাঁদেরই ভেতরে উজ্জীবীত হয় আত্মবৃত্তকে অতিক্রমণের প্রার্থনা। বলা সম্ভব হয়,

আমি বহু বাসনায় প্রাণপনে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
ত্রীবন ভরে।

'গীতাঞ্জলি'-র দ্বিতীয় কবিতা এতি। যার শেষাংশ—/

এ যে তব দয়া, তনি তনি হায়,
নিতে চাও বলে ফিরাও আমায়।
পূর্ণ করিয়া লবে এ ত্রীবন তব মিলনেরই যোগ্য করে
আধা-ইচ্ছার সংকত হতে বাঁচায়ে মোরে।

সুতরাং বাসনা-র ভাইরাসে 'আমি' সত্তাতি রক্তাক্ত। যত রক্তাক্ত তত দূর্বল। ক্লান্ত আর বিপন্ন। 'সংকত' এই। চারপাশে প্রত্যাশার তুলকালাম নৃত্য। কোনো বিশেষ কিছুর প্রত্যাশা ছেড়ে নির্বিশেষ প্রত্যাশার শূন্য বৃত্তের আঁধার-গর্ভে বিলীন। চাওয়া-পাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে নতুন চাওয়ার খসড়া। প্রত্যাশা-লব্ধকাম-লক্ষ্যভ্রষ্টতা আবার সঙ্গে সঙ্গে পুনঃপ্রত্যাশীদের প্রবল দৌড়বাত্তির মধ্যে কী নিদারুণ নিঃসঙ্গতাত্রত অতৃপ্তি। তৃপ্তির খোঁতে বাসনা মুক্তির প্রার্থনা পরমের কাছে। প্রার্থনা করতেই হবে তাঁদের। ভূমিত্রতক নভোচারীদের। কারণ, ভয়ঙ্কর স্বাধীনচেতা ওরা। ইতিহাস-সমাত্রের কার্যকারণাত্মক যৌক্তিক ফ্রেমে আতকা পড়েও স্বাধীন-ইচ্ছের বশ। 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ তাকার স্বপ্ন' দেখবার ইচ্ছে তাই এত অনায়াস। হুঁশিয়ারিহীন। মার্কস যতই বলুন, আমাদের ইচ্ছে আসলে ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত। ফ্রয়েড বলুন, আমাদের ইচ্ছে লিঙ্গ-নির্দিষ্ট। অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারহীন। সেই ইচ্ছেকে ইচ্ছে খুশিতে পরিণত করতে পারে 'আমি' নামক সত্তা। ইতিহাস সমাত বা লিঙ্গকেন্দ্রিক প্রভুত্ব ভেঙে কেবলমাত্র যে দাসত্ব স্বীকার করে ইচ্ছের কাছে। সেই ইচ্ছেই বলছে 'আমি' স্বাধীন। বলছে, 'আমি'-র অতীত অকেত্রে, সমাত সংযোগ শূন্য। একলা নিংসঙ্গ। তাই স্বাধীন। তাঁ পল সাত্র-র মতে, 'Freedom is the human being putting his passed out of play by secreting his own nothingness.' (স্বাধীনতা বলতে বুঝি সেই মানুষ যে তার অতীতকে ক্রমাগত অকেত্রে করে দিচ্ছে নিত্রেই মধ্য থেকে শূন্যতার ত্ম দিয়ে)। সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মুখ্য। ব্যক্তি ইচ্ছের ত্মধ্বনি সেখানে। সবার উপরে ব্যক্তিসত্য তাহার উপরে নাই। এ কেমন ব্যক্তি! অভিজ্ঞতার ভান্ডার যাঁর পূর্ণ। ত্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ত্রীবনের প্রতিতি ত্রীপ যার নখদর্পণে অথচ সামাতিক শ্লোগান মেনে নয়-এ বোধ কেবলই নিত্রের অবেচেতনার উপলব্ধি তত। স্ব-নির্বাচনভুক্ত। 'ত্রীবন স্মৃতি'র স্মৃতি-ফলকের বুকে যেমন লেখা হয়েছিল একতন কিশোর কবির আদিম হৃদয়-সংবাদ।

আমার হৃদয় আমারি হৃদয়
বেচিনিতো তাহা কাহারও কাছে,
ভাঙাচোরা হোক, বা হোক তা হোক,
আমার হৃদয় আমারি আছে।

বুঞ দেব এই পথেই তবে স্বাধীন হতে চেয়েছিলেন। ত্ম-মৃত্যুর আবর্তনচক্রের নিয়তিবাদী প্রভুত্ব থেকে রেহাই পেতে ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিলেন। স্বতনদের আহ্বান, পিছুডাক তাঁকে গৃহমুখী করতে পারেনি। বরং-রাত-অন্তঃপুরের আশ্রয়চ্যুত হয়ে যেন বাঁচলেন তিনি। বুঞ চরিত বইতে অশ্বঘোষ লিখছেন, (অনুবাদ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) কপিলাবস্তু পরিত্যাগ করে যুবরাতবহুযোতন পথ পার হলেন 'ইন্দ্রের উচ্চৈঃ শ্রবাতুল্য অশ্বে আরোহন করে। অতঃপর প্রসন্ন এক ঊষায় ভার্গব অরণ্যে প্রবেশ করে আদিগন্ত বিস্তৃত অরণ্যানী দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন 'নিস্তার পাইলাম'। (৬/৪) সঙ্গী, রাতদূত ছণ্ডককে ফিরে যেতে বললেন রাতধানীতে। স্পষ্ট তনালেন, ''আমি ত্রা-মরণ নাশের তন্যই

তপোবনে প্রবেশ করিয়াছি। স্বর্গলাভের তৃষতয়, স্নেহের অভাবে বা ক্রোধের তন্য নহে।" (৬/১৪-১৫) বললেন, "আমি অভিনিষ্ক্রান্ত হইয়াছি বলিয়া, আমার তন্য শোক করা উচিত নহে। মিলন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও তাহা এক সময়ে ছিন্ন হয়ই হয়।" (৬/১৬)

"বিচ্ছেদ ধ্রুব বলিয়াই, আমার মোক্ষের নিমিত্ত মতি হইয়াছে। যাহাতে স্বতন হইতে বিচ্ছেদ পুনরায় আর না হয়।" (৬/১৭)

যুবরাত সিঃার্থ তখন তানতেন না, বোধিসত্ত্ব অর্তনের শীর্ষকেন্দ্রে তিনি ঠিক কতকাল পরে পৌঁছোবেন। কেবল অনুভব করেছেন অন্তর্চৈর্তণ্যের নিবিড় আকুতি। স্বতোপ্রণোদিত ইচ্ছের প্রবল ডাক। একে তুচ্ছ করা অসম্ভব। অথচ সেই একই ব্যক্তি বোধি লাভের পরে যখন প্রবর্তন করলেন বৌঃিক আপ্ত দর্শন—প্রতিষ্ঠা করলেন মহাভিক্ষু সংঘ, 'সংঘরাম'—ঘোষণা করলেন সাধনাত্তত উপলব্ধি 'সর্বম অনিত্যম্ সর্বম্ শূন্যম্'—তখন সেই ক্ষণিকত্ববাদী বৌঃ-ধর্মদর্শনের প্রবক্তাকে একতা বিরাত মহতী সম্প্রদায় ঈশ্বর বানিয়ে তুলল। বৌঃ-ধর্মাদর্শে উদ্ভাসিত হল যুগের অলঙ্ঘনীয় শাশ্বতসত্য। ১৩১৬ সালে পৌষ মাসে রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'তে এই নিয়ে লিখলেন 'তপোবন' প্রবন্ধ। যার শেষ অনুচ্ছেদে আছে, "আত আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করিতে পারে সে সত্যতি কী! সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বরাত্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হইয়াছে, উপনিষদে উচ্চারিত হইয়াছে, গীতায় ব্যাখাত হইয়াছে। বুঃদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানের নিত্য ব্যবহারে সফল করিয়া তুলিবার তন্য তপস্যা করিয়াছেন।" তার মানে তপস্যা করেছেন বুঃদেব ব্যক্তিগত ইচ্ছের উন্মুখতায়। সাধনলব্ধ সত্য তাঁকে সিঃপুরুষ বানিয়েছে। আর সেই পৌরুষ যুগের দাবিতে অবতারত্বে রূপান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছে।

নবদ্বীপের চৈতন্যবান একতি তরুণ যেমন করে 'মহাপ্রভু'তে পরিণতি পেয়েছিলেন। আত্ম-অভিলাষী চঞ্চল কিশোর তিলে তিলে নিত্তেকে নির্মাণ করে তুলেছিলেন সন্ন্যাসীরূপে। এ তাঁর ব্যক্তিগত আকাঙ্খার ফল। মনোগত ইচ্ছে-কুসুমের 'পুলক-মুকুল' হয়ে ফুতে ওঠা। প্রাক্-সন্ন্যাস পর্বে তিনি কখনো রাধা, কখনো কৃষত। নীলাচলে গম্ভীরা লীলায় কেবলই রাধা। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে কৃষতদাস কবিরাত বর্ণনা করেছেন সেই রূপ। 'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গী ভেল / অনুদিন বাঢ়ল অবধি ন গেল।/ন সো রমণ ন হাম রমণী / দুহুঁ মন মনোভব পেশল তানি।' ফলে বঙ্গে-বহির্বঙ্গে 'রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা'র অক্লান্ত প্রসার। কৃষত-নাম সঙ্কীর্তনে, গৌড়ীয় বৈষতব ভাবোন্মাদনায় নদে-শান্তিপুরের ভেসে যাওয়া। শুধু স্ব-ভূমিতে নয়, নবদ্বীপ ছেড়ে নীলাচলে, নীলাচল হয়ে ভান্ডারীবন, শ্যামকুন্ড, রাধাকুন্ড সহ বৃণ্ডাবনে শ্রী গৌরাঙ্গ ছুতে গেছেন। বৃণ্ডাবনকে বৈষতব মন্ত্রে পুনরুঃার করতে। আসলে তুর্কি পরাক্রমোত্তর রাষ্ট্রিয় অভিঘাত, আচার, সংস্কার, বর্ণান্ধতা, ধর্মান্ধতা-সর্বস্ব-হিণ্ডুধর্মের সামাতিক সার্বিক অবক্ষয় রোধের সংকল্পে চৈতন্যদেবের বৈষতবীয় লীলার এহেন পুনর্গঠন। পরিণামে একতন মন্ময় স্বেচ্ছাবিহারী যুবকের যুগ-তাগিদে আত্ম-রূপান্তর। যথারীতি অবতার হয়ে ওঠা।

রবীন্দ্রনাথ অবতার হননি। হয়ে উঠেছিলেন গুরুদেব। বিষয়তা প্রায় কাছাকাছি। শান্তিনিকেতনে প্রথম দিককার শিক্ষক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন তাঁকে 'গুরুদেব' বলে ডেকেছিলেন (গান্ধী পরে যা প্রচার করেছিলেন), তখন সেই উপাধি কবিকে বিব্রত করেছিল। বারবার বলেছিলেন যে, তিনি গুরু নন, শিক্ষক নন। শুধুই কবি। ভেতরে কেঁদে চলা নিয়ত অপূর্ণতার যে বোধ তা শুধুই পূর্ণকবিত্বের সন্ধানে। এই সন্ধান চৈতন্যের। এক 'আমি' থেকে অন্য 'আমি'তে যাত্রার। তাই অপূর্ণতার অবিরাম বেদনা, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা, যার সঙ্গে সেই অর্থে যোগ নেই সামাতিক—পারিবারিক রাষ্ট্রিক তাড়নার। এ যন্ত্রণার মূলে স্বাধীন ইচ্ছের আঘাত। আশৈশব। আকৈশোর। আর এ সবের মধ্যেই হঠাৎ একদিন লব্ধকাম হয়ে ওঠা। অনুভূতির অন্ধকার সুড়ঙ্গে আলোর উল্লাস। 'তীবনস্মৃতি'তে আত্মোপলব্ধির সেই প্রথম অঙ্কুরোদ্‌গম বর্ণিত হয়েছে এইভাবে —'আমার মনে আছে ত্তাৎতাকে কেমন করিয়া দেখিলে যে ঠিকমতো দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে নিত্তের ভার লাঘব হয় সেই কথা একদিন বাড়ির কোনো আত্মীয়কে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম—কিছুমাত্র কৃতকার্য হই নাই, তাহা তানি। এমন সময় আমার তীবনের একতা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। তাহা আত পর্যন্ত তুলিতে পারি নাই।"

"একদিন সকালে বারাণ্ডায় দাঁড়ইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একতা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনণ্ডে ও সৌণ্ডর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একতা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরতাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাতি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।"

কবিত্বের এহেন উৎসারণ একতন বিশেষ মানুষের। হৃদয়ের স্তরে স্তরে বেদনার সৃষ্টি মূলে যে অভিঘাত, তরঙ্গ বিচ্ছুরণ, উদ্ভাস—সে সবই একতন বিশেষ কবির। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে সেই কবি আত্মানুভবকে যখন অপরের কাছে পৌঁছে দেন তখন, অভিজ্ঞতার ঐ একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্ত থেকে তন্ম নেয় উপলব্ধির 'দর্শন'। ব্যক্তিগত যাবতীয় দেখা তাত্ত্বিক অভিমুখ পায়। চিহ্নিত হয় 'আত্মার ধর্ম' রূপে। যে ধর্ম মানুষের শরীর প্রাণের চেয়ে বড়। যা তার মনুষ্যত্ব। 'প্রাণের ভিতরকার সৃতনীশক্তি'। এই সৃতনীশক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন রবীন্দ্রনাথ। বললেন, 'মানুষের প্রধান বল আধ্যাত্মিক বল। মানুষের প্রধান মনুষ্যত্ব আধ্যাত্মিকতা। শারীরিকতা বা মানসিকতা দেশ কাল পাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অনন্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের সহিত আমাদের যে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র

ক্ষুদ্র নহি, ইহাই অনুভব করা আধ্যাত্মিকতার একতি লক্ষণ।' রবীন্দ্রনাথের 'আমি' এখানে আমরায় পর্যবসিত। একলার অভিজ্ঞতায় ভুয়োদর্শন প্রতিফলিত। যেকোনো দর্শনই তাই। একতা 'ইত্ম'-এর ওপর যার প্রতিষ্ঠা। 'ইত্ম' বা 'তত্ত্ব' যত বহমাত্রিক হোক না কেন ব্যক্তি বা পর্ব বিশেষে তার ভিত্তি হল বিশ্বাসবাদ। যে-কোনো 'ইত্ম' আসলে 'বিলিভিত্ম'।

কাজেই রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন, তিনি গুরু নন-শিক্ষক নন-কেবলই কবি। তাতে 'রবীন্দ্রদর্শনে'র এমন সার্বিক প্রত্তিপত্তি সম্ভব না। শুধু দর্শন কেন, বৃহত্তর ভারত সংগঠনের কাতেও তাঁর গুরুদেব মূর্তি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছ। ব্রহ্মচর্যাশ্রম নির্মাণ সেই সংগঠনের একদিক। 'গুরু'র গুরত্বকে স্বীকার করে নিয়ে তার কালোপযোগী ব্যাখ্যাও দিতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে।....

"আমাদের সমাত্ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁত্তিতেছি যিনি আমাদের ত্রীবনকে গতিদান করিবে; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁত্তিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন।"....

বাউলের মনোমর্গে স্বেচ্ছাবিহার যেমন গুরুর নির্দেশে সঠিক পথ পায়, বলে, 'দিন গেল আর মিছা গরব কর না / মন পাগল রে গুরু ভত্না।' গুরু-শিষ্যের যুগবাহিত পরম্পরায় তেমনি রচিত হয় মানববৈতন্যের উত্তরাধিকার। বুঞ দেব এমনতাই চেয়েছিলেন। সঙ্গী ছণ্ডককে তাই বলেছিলেন, "মানুষের মৃত্যুতে, তাহার অর্থের বহু উত্তরাধিকারী পাওয়া যায়, কিন্তু পৃথিবীতে ধর্মের উত্তরাধিকারী অত্যন্ত দুর্লভ, কিংবা একেবারেই নাই।" সত্যধর্মের উত্তরাধিকারিত্বের ত্ম হয়ত তখন থেকেই। কিংবা তারও আগে। কুরুক্ষেত্রের যুঞ প্রাঙ্গণে শ্রেষ্ঠ রথী যখন যুঞ বিমুখ। তাঁর আত্মার 'আমিত্ব' প্রিয়ত্নের বিরুঞে অস্ত্রধারণে প্রতিবাদ ত্নাচ্ছে। ঠিক তখন তাঁকে স্ব-পথে, স্ব-মতে আনবার ত্ন্য শোনানো হল সেই বিখ্যাত পংক্তি-'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্মফলহের্তুর্ভুমাতে সঙ্গোৎত্ত্বককর্মণি।' অর্থাৎ, তুমি কেউ নও। বুঝিয়ে দেওয়া হল, তোমার খেয়ালখুশিতে তোমার সীমাহীন অধিকার নেই। ততটুকুই অধিকার, যাতে সমাত্তের চিরমঙ্গল।

শ্রীমদ্ভাগবত-গীতা কৃষেত্র দর্শন-পীঠভূমি। অর্তুনের উদ্দেশে বলে চলা আর্ষ-বিচার। সমস্ত গীতার মধ্যে অর্তুন মাত্র দু'বার স্পষ্ট ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে মত প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় ও একাদশ অধ্যায়ে। দ্বিতীয়তে অর্তুন-স্ব-ইচ্ছের বশ। শেষে বিনীত দাসানুদাস, এবং গুরুর আজ্ঞাবহ। কৃষত আদ্যন্ত গুরুর ভূমিকায়। কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গণে অর্তুনের রথ সারথি কৃষত। শাস্ত্রে সারথিকে রথীর উপদেষ্টার আসন দেওয়া হয়েছে। তাই গীতার শুরুতে কৃষেত্র সারথিধর্ম পালন প্রাসঙ্গিক। অতঃপর বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে শ্রীকৃষেত্র ঈশ্বর মূর্তি ধারণ। শেষোক্ত রূপের সামনে অর্তুন হার মানতে বাধ্য। অনাসক্তির শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অলোকিত রূপদর্শনে মুহ্যমান হয়ে পড়তে বাধ্য। বুঝতে হবেই তাঁকে "অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞান শ্রেয়, জ্ঞানের চেয়ে ধ্যান এবং ধ্যানের চেয়ে কর্মফল ত্যাগ।" কর্মফল ত্যাগ করতে পারে কেবল অনাসক্ত। ত্রীবিত বা মৃত কারো ত্ন্য শোক করবে না সে। পাপ-পুণ্যকে সমদৃষ্টিতে দেখবে এবং কর্মাচরণে ভেসে যাবে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের গীতার কৃষেত্র প্রতি অর্তুনের যৌক্তিক বিতন্ডা তাই বিশ্বরূপ প্রদর্শনকারী কৃষেত্র অলৌকিক বিজ্ঞাপনের সামনে লয়প্রাপ্ত হল।

লয়প্রাপ্ত হয়েছিল সুদর্শনাও। স্বামীকে অন্ধকার ঘর ছেড়ে আলোয় দেখতে চাইবার অহংবান প্রত্যাশা চুরমার হয়ে গেছিল তার। 'রাত্র' নাতকের পৃষ্ঠায-পৃষ্ঠায় আছে অহংকারী রূপ-রসিক একতি মেয়ের আত্মিক পরাত্নয়ের ছবি। লব্ধ হয়েছিল কঠোরতম শিক্ষা। বলতে হয়েছিল "বেঁচেছি, বেঁচেছি সুরঙ্গমা। হার মেনে তবে বেঁচেছি? ওরে বাসরে। কী কঠিন অভিমান। কিছুতেই গলতে চায় না। আমার রাত্র কেন আমার কাছে আসতে যাবে—আমিই তাঁর কাছে যাব এই কথাতা কোনোমতেই মনকে বলতে পারছিলাম না। সমস্ত রাততা সেই ত্নালায় পড়ে ধুলোয় লুতিয়ে কেঁদেছি—দখিনা হাওয়া বুকের বেদনার মতো হু হু করে বয়েছে...." অর্তুনের মত সুদর্শনাও বুঝছে, পরমের ইচ্ছেই শেষ ইচ্ছে। কোনো দেখা নয়, শোনা নয়, চাওয়া নয়, কেবল গভীরের মধ্যে নিত্তেকে ছেড়ে দেওয়া। অরূপ দৃষ্টিপাতে রূপকে পাওয়া।

যুগ যুগ ধরে এই চলেছে। ব্যক্তির 'আমিত্ব' তেড়েফুড়ে মাথাচাড়া দিয়ে বলছে—'যে পথে চলেছি আমি সেই ছিল অভীষ্ট আমার'। বলেছে—

'তাহাদের মন
আমার মনের মত নাকি?
তবু কেন এমন একাকী?
তবু আমি এমন একাকী?

অথচ সেই লোকতাই তাঁর 'স্বগত-চৈতন্য', 'ইচ্ছার নির্বাচন' নিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে যুথত্রীবনের সঙ্গে। ভারসাম্যের কেন্দ্রে হয়ত এমন কেউ আছেন যিনি ব্যক্তির আত্মস্থ শক্তি হয়ে গুরুর মত পথ দেখান। ব্যক্তির 'অহং' নিত্তের আপন থেকে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়ালে দেখা হয় তাঁর সঙ্গে। নতুন করে ঝাড়াই বাছাই হয় চেতনার। কেবল 'আমার' একলার ইচ্ছের তাড়নায় ছুতে চলা 'আমি' তখন বোঝে, আত্মবৃত্তে বন্ধ থাকবার কাল হল শিক্ষানবিশির। রবীন্দ্রনাথে যা 'ছোত আমি'-র কৃত্য। যার নাম 'প্রেয়'। এই প্রেয় পরিণতি লাভ করে পরসুখ কামনায়। উত্তীর্ণ হয় 'বড় আমি'তে। শ্রেয় রূপে। শ্রেয়ের ডাকেই 'একতি ছেলে আসিয়া একত্ন মাকে সকল ছেলের মা করিয়া দেয়। যার ছেলে নাই তার কাছে অনন্ত স্বর্গের দ্বার রুঞ।' রবীন্দ্রনাথের আগে এমন ভাবনা ছিল বঙ্কিমে। কমলাকান্তের দপ্তরে। 'পরসুখবর্ধন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল আছে কিনা। নাই।' এমনকি, 'যদি আপন পরিবারকে ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্যত্বতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা

বিবাহ করিয়াছ,.... যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।' এমনকি এই হালেও, ২০০৩-এ ড. ত্রিগুণা সেন স্মারক বক্তৃতায় 'স্মৃতিতর্পণ', শিরোনামা বক্তব্যে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বললেন, 'Knowledge for knowledge's sake' নয়, 'knowledge for society's sake'. শিক্ষার উদ্দেশ্যই নাকি তাই। অন্যদিকে পল র‍্যাঁত্তর-এর মত অস্তিবাদী তাত্ত্বিকের বক্তব্য হল, 'Extentialism is rejection of all purely abstract thinking of a purely logical or scientific philosophy.' তাত্ত্বিকদের এইসব তেরালো বক্তৃতার পাশে তুকরো কাত্তের আর একরকম বত্তিশ কেমন চমকে দেয় জ্ঞান আর যুক্তির প্রসাধনে গোছানো মনতাকে। কবি-অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত যখন বলেন, ".....যিনি কবিতা লেখেন, তিনি চির-পরীক্ষার্থী। তিনি জ্ঞান-বৃঞের চওন তিলক এঁকে শুধু রচনা করবেন, তা হতে পারে না। যখন কবিকে সবাই মেনে নেয়, তখন কবির মৃত্যু হতে থাকে।" 'কবি'র দলে ওঁরা সবাই আছেন। উন্মুখ আকূতি নিয়ে সৃষ্টির মৌলকেন্দ্রে যাঁদের যাত্রা। সব স্রষ্টাই তো একপক্ষে কবি। কবিরেণ প্রত্তপতিঃ। বুঞ দেব চৈতন্যদেব রবীন্দ্রনাথে তখন ফারাকশূন্য মহাকাশ।

এই যুঞ চলছে। চলবেও। তেলে-তলে মিশ খায় না। একদিকে অস্তিত্বে-চৈতন্য ব্যক্তিত্বের গূঢ়মূল, অন্যদিকে সমাত চৈতন্যের বোধনে যূথত্তিবনের মঙ্গল-কামনা। একই ব্যক্তিতে সম্ভব এমন রহস্যময় দ্বৈত-তগরণ! হয়ত সম্ভব। সমাত-মনস্কের মননাভ মুদ্রায় তখন মর্ত্যচূর্ণতার ইচ্ছে-ছবিও তয়গা করে নেয়। ব্যক্তির মানসিক অভিযান সামাত্তিক মঙ্গলের প্রদীপতি ত্বলিয়ে বলে, সে অমৃতসঃ পুত্রাঃ।

ঋণ স্বীকার

১। আবু সরীদ আইয়ুব। আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ। দে'ত পাবলিশিং। তুলাই ২০১১।
২। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত দোঁহাবলী। বসুমতী কর্পোরেশন লিমিতেড।
৩। গুণময় মান্না। রবীন্দ্ররচনার দর্শনভূমি। প্যাপিরাস। তনুয়ারি ১৯১৩।
৪। ক্ষিতিমোহন সেন। ভারতের সংস্কৃতি। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা। তৈষ্ঠ ১৪১৯।
৫। তগন্নাথ চক্রবর্তী। গীতাঞ্জলিঃ অস্তিত্ব বিরহ। আনণ্ড পাবলিশার্স। তুলাই ২০০৯।
৬। তহ্নবী কুমার চক্রবর্তী। চর্যাগীতির ভূমিকা। ডি.এম.লাইব্রেরি। ১৯৩০।
৭। ত্তিবনানণ্ড দাশ। শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভারবি। সেপ্টেম্বর ১৯৮৮।
৮। প্রবোধচন্দ্র বাগচী। বৌঞ ধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা। মাঘ ১৪০৪।
৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ। প্রবন্ধ খন্ড। প্রথম ও শেষ অংশ।
১০। বিনয় ঘোষ। মেত্রোপলিতন মন ঃ মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ। ওরিয়েন্ত লংম্যান। এপ্রিল ১৯৯৯।
১১। বুঞ দেব বসু সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা। এম.সি.সরকার। তুলাই ১৯৮৩।
১২। মুহম্মদ এনামুল্ হক। বঙ্গে স্থুফী প্রভাব। র‍্যামন পাবলিশার্স। ফেব্রুয়ারী, ২০১১।
১৩। মৃণালকান্তি ভদ্র। অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। ৩ চৈত্র ১৪০৯।
১৪। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত অশ্বঘোষের বুঞ চরিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। আশ্বিণ ১৩১৬।
১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র রচনাবলী। চতুর্থ খন্ড। পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তুলাই, ১৯৮৭।
১৬। তদেব। একাদশ খন্ড। অগষ্ট ১৯৮৯।
১৭। তদেব। ত্রয়োদশ খন্ড। নভেম্বর ১৯৯০।
১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র রচনাবলী। দ্বাদশখন্ড। তন্ম-শতবার্ষিকী সংস্করণ। পশ্চিমবঙ্গ। বৈশাখ ১৩৬৮।
১৯। শক্তি চট্টোপাধ্যায়। পদ্য সমগ্র ১। আনণ্ড পাবলিশার্স। বৈশাখ ১৪০০।
২০। স্বামী গম্ভীরানণ্ড সম্পাদিত উপনিষদ্ গ্রন্থবলী। উদ্বোধন কার্যালয়। কলিকাতা (১-৩ খন্ড) ফাল্গুন ১৪১৪-আশ্বিন ১৪১৫।
২১। Charles Dickens, A Tale of Two Citis. Script Publication, Kolkata, Jan 2007
২২। J.P. Sartre, Being and Nothingness : An Essay on Phenomenological Ontology (translated by Hazel Barnes) New York : Philosophical Library, 1956.
২৩। Narahari Kaviraj. What is Post-Modernism. K. P. Bagchi. Kolkata 2005.
২৪। Paul Roubiczek, Existentialism : for and agianst. 1409.